প্রতিকার

- গাছের নীচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে ফল মার্বেল আকারের হওয়ার পর থেকে ইন্ডোফিল এম-৪৫ অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের (অটোস্টিন/নোইন) ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ: এ রোগ ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাক দ্বারা হয়। পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে আসে এবং পরে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছই ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

চিত্র ১৩. ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ

প্রতিকার

এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাই একে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

- মাঠে/বাগানে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আদি জোড় যেমন: এল-৪৯, স্ট্রবেরি পেয়ারা এবং পলি পেয়ারা এর সাথে কলম করে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- বাগানের মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ কমানোর জন্য চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- এছাড়া মাটি শোধন করেও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন আগে আধা-পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর অথবা ট্রাইকোকম্পোস্ট ২.৫ টন/হেক্টর মাটির সাথে মিশিয়ে এ রোগ দমন করা সম্ভব।

শুটিমোল্ড: এটি ছত্রাকজনিত এক প্রকার রোগ। সাদা মাছি পোকা ও মিলিবাগ এর আক্রমণের ফলে শীতের সময় পেয়ারা গাছের পাতা ছাই এর মত পদার্থ দিয়ে আবৃত হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে ও গাছ দুর্বল হয়ে যায়।

চিত্র ১৪. শুটিমোল্ড আক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

- সাদা মাছি পোকা ও মিলিবাগ দমনের মাধ্যমে শুটিমোল্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের (নোইন/অটোস্টিন) অথবা ম্যানকোজেব গ্রুপের (ডায়াথেন এম-৪৫) ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী পোকা: বর্ষাকালে পূর্ণবয়স্ক পোকা ফলের উপরের পৃষ্ঠে ডিম পাড়ে। ডিম ফেটে কীড়া বের হয়ে ফল ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে ফলের শাঁস ও বীজ খেয়ে বড় হতে থাকে। আক্রান্ত ফল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঝরে যায়। এ পোকার আক্রমণ পাহাড়ী এলাকায় বেশী হয়।

প্রতিকার

- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করা।
- গাছে বা মাটিতে পড়ে থাকা আক্রান্ত ফল সংগ্রহপূর্বক ধ্বংস করা।
- ফল মার্বেলাকৃতি হলে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন বা বাদামী কাগজ দিয়ে ব্যাগিং করলে এ পোকার আক্রমণ শতভাগ প্রতিহত করা সম্ভব।
- ফল মার্বেল আকার অবস্থায় এমামেকটিন গ্রুপের (প্রোক্লেম ৫ এসজি) কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর গাছে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র ১৫. মিলিবাগ ও সাদা মাছি আক্রান্ত পাতা

মিলিবাগ ও সাদা মাছি: পেয়ারা পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়। এরা গাছের পাতা, ডগা এবং ফুল থেকে রস শুষে খায়। রস শোষণের সময় পাতায় মধু সদৃশ বিষ্ঠা ত্যাগ করে এবং সেই বিষ্ঠার উপরই শুটিমোল্ড জন্মে ও পাতা কালো বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায় ও ফলন বেশ কমে যায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করতে হবে এবং বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ফাইট্রোক্লিন প্রতি লিটার পানিতে ৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার অথবা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক যেমন: সেভিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা ডাইমেথয়েট (হেমিথোয়েট/থিওমেট/টাফগর ৪০ ইসি) গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে এ পোকা কার্যকরভাবে দমন করা যায়।

ফলের মাছি পোকা: স্ত্রী মাছি পোকা ফল পরিপক্ক হতে শুরু করলে ফলের খোসার নীচে ডিম পাড়ে। কীড়া বা ম্যাগট ডিম ফুটে বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে নষ্ট করে ফেলে ও ফল পচে যায়।

চিত্র ১৬. মাছি পোকা আক্রান্ত ফল

প্রতিকার

- আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- ফল ছোট অবস্থায় (৪৫-৫০ দিন বয়সে) ব্যাগিং করে ফলের মাছি পোকা দমন করা যায়। এছাড়া মিথাইল ইউজেনলযুক্ত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়।

পাতা খাওয়া পোকা (চেফার বিটল): পূর্ণাঙ্গ পোকা সাধারণত রাতের বেলায় পাতা খায় ও দিনের বেলায় আগাছা বা লতাপাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। এ পোকা গাছের পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে। আক্রমণ বেশী হলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।

প্রতিকার

- পেয়ারা বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ফেনিট্রথিয়ন (সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন/ফেনিটন ৫০ ইসি) অথবা ক্লোরপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন (নাইট্রো ৫০৫ ইসি) গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ

সাধারণত ফুল আসার ৪-৫ মাসের মধ্যেই পেয়ারা সংগ্রহ করা যায়। ফল পরিপক্ক (mature) হলে সবুজ হতে আস্তে আস্তে হলদে সবুজে পরিণত হয় এবং এ অবস্থায় পেয়ারা সংগ্রহ করতে হবে। পেয়ারা বেশী পাকতে দেয়া উচিত নয়। পরিপক্ক পেয়ারা বোঁটা বা দু-একটা পাতাসহ কেটে বাজারজাত করলে দেখতে সতেজ মনে হয় এবং দাম বেশী পাওয়া যায়। ফল ৮-১৪° সে. তাপমাত্রায় ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

রচনায়

মোঃ তরিকুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ড. এএসএম মেজবাহ উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
জয়দেব গোমস্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মনিরুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আসমা আনোয়ারী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনায়

ড. বাবুল চন্দ্র সরকার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর
ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক
উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর

অর্থায়নে জিওবি এবং ইফাদ

প্রকাশ কাল জুন ২০২০ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০ কপি

প্রকাশনা সংখ্যা ১১ (এগার)

অধিক তথ্যের জন্য

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১৩২, ০২ ৪৯২৭০১৮৮
ই-মেইল: cso.pom.hrc.bari@gmail.com
ও
ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী
কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট
এবং
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১২১, ০১৮১৯-১২৮৩০২
ই-মেইল: apurba.chowdhury@gmail.com, bd_apurba@yahoo.com

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।
Cell: 01716-855998, E-mail: printvalley@gmail.com

পেয়ারা উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

পেয়ারা উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি

ভূমিকা: পেয়ারাকে উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। পেয়ারা গাছ খুব কম সময়ের মধ্যে ফল দিয়ে থাকে এবং এর চাষের জন্য বেশী জায়গার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে পেয়ারার বাণিজ্যিক চাষাবাদ বিভিন্ন জেলায় দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। পেয়ারা ভিটামিন 'সি' এর একটি প্রধান উৎস। ভিটামিন সি সহ অন্যান্য পুষ্টিমানের বিবেচনায় পেয়ারা, আপেল ও কমলার চেয়ে উৎকৃষ্ট। পেয়ারার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ২১০ মি. গ্রা. ভিটামিন সি পাওয়া যায়। পেয়ারার জেলী সকলের নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে এ পর্যন্ত পেয়ারার ৪টি উন্নত জাত; কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২, বারি পেয়ারা-৩ এবং বারি পেয়ারা-৪ উদ্ভাবিত হয়েছে। জাতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে দেয়া হলো।

কাজী পেয়ারা: বছরে দু'বার ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল এবং মধ্যম ঝোপালো জাত। ফল উপবৃত্তাকার, বোঁটার দিকে সামান্য সরু, গড় ওজন ৪৪৫ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে কচকচে, সামান্য টক স্বাদযুক্ত (ব্রিক্সমান ৮%) এবং অল্প বীজসমৃদ্ধ। গাছ প্রতি বছরে ৬০ কেজি ফল পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ফলন ২৮ টন।

চিত্র ১. কাজী পেয়ারা

বারি পেয়ারা-২: কমবেশী সারাবছর ফল প্রদানকারী একটি উচ্চফলনশীল, খর্বাকৃতির এবং মধ্যম ঝোপালো জাত। ফল গোলাকার, গড় ওজন ৪০০ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১০%) এবং কচকচে। বীজ অল্প ও নরম। গাছ প্রতি বছরে ৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ৩০ টন।

চিত্র ২. বারি পেয়ারা-২

বারি পেয়ারা-৩: বছরে একবার ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল, মধ্যমাকৃতির এবং মধ্যম ঝোপালো জাত। ফল উপবৃত্তাকার, গড় ওজন ১৭৫ গ্রাম, শাঁস গোলাপী, নরম, অল্প মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৯%)। শাঁসে পেক্টিনের পরিমাণ বেশী থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উত্তম জাত। গাছপ্রতি বছরে ১৮ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন।

চিত্র ৩. বারি পেয়ারা-৩

বারি পেয়ারা-৪ (বীজবিহীন): বছরে একবার ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল, বীজবিহীন, খর্বাকৃতির এবং অমৌসুমী জাত। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৮৪ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৯.৫%) ও কচকচে এবং দীর্ঘ সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন। গাছ প্রতি বছরে ৮৪.৪ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন।

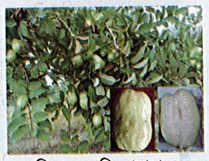
চিত্র ৪. বারি পেয়ারা-৪ (বীজবিহীন)

উৎপাদন প্রযুক্তি

পেয়ারা গাছ হতে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য কলম/চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। এগুলো সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রতিবছর আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেয়ারা ভালভাবে জন্মে। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেয়ারা জন্মে তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি এ ফলের জন্য বেশী উপযোগী। ৪.৫-৮.২ অম্লক্ষারত্বের মাটিতে এটি সহজে জন্মে।

বংশ বিস্তার বা চারা উৎপাদন: পেয়ারা বীজ দ্বারা সহজেই বংশ বিস্তার করা যায়। কিন্তু বীজের গাছে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না এবং ফল অনেক সময় নিম্নমানের হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করলে মাতৃ গুণাগুণ বজায় থাকে। তাই অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করাই উত্তম। অঙ্গজ পদ্ধতির মধ্যে গুটিকলমই অধিক প্রচলিত। তবে গ্রাফ্‌টিং বা জোড় কলম পদ্ধতিতেও বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। জোড় কলমের ক্ষেত্রে এল-৪৯, পলি পেয়ারা এবং স্ট্রবেরি পেয়ারা বীজের চারাকে আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করলে ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন গাছ তৈরি করা সম্ভব।

চিত্র ৫. পলি পেয়ারা

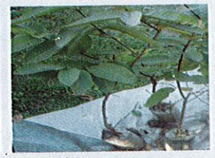
চিত্র ৬. এল-৪৯

গুটিকলম: গুটিকলম করার উপযুক্ত সময় হলো মে-জুলাই মাস। কলম বাঁধার জন্য সুস্থ সবল গাছের পেন্সিলের মত মোটা ডাল বেছে নিয়ে ডালটির আগা হতে নীচের দিকে ৩০-৪০ সে. মি. জায়গা ছেড়ে দিয়ে ৪-৫ সে. মি. পরিমাণ স্থানের বাকল কেটে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে তুলে ফেলতে হবে। এরপর কাটা স্থানের চারদিক পঁচা গোবর মিশ্রিত কাঁদা মাটি ২.০-২.৫ সে. মি. পুরু করে লাগিয়ে পলিথিন কাগজ দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিতে হয়। গুটিকলম বাঁধার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যেই শিকড় বের হয়। শিকড় বাদামী রং ধারণ করলে যেখানে গুটি বাঁধা হয় তার নীচ দিয়ে ডালটিকে কেটে নামাতে হবে। গুটিটি মাতৃগাছ থেকে কাটার পর পাতা ফেলে দিয়ে কয়েকদিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দিতে হয়। অতঃপর গুটিকলমগুলো যত্ন সহকারে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টবে লাগাতে হবে এবং মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে। গুটিকলমগুলো এভাবে সঠিক যত্ন নিলে ১৫-২০ দিনের মধ্যে নতুন পাতা ও শিকড় গজাতে শুরু করবে এবং ৪-৫ মাস পর লাগানোর উপযোগী হবে।

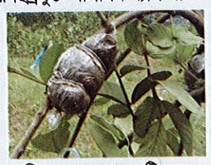
চিত্র ৭. পেয়ারার গুটিকলম

গর্ত তৈরী, সার প্রয়োগ এবং কলম বা চারা রোপণ: এক বছর বয়সের কলম/চারা ৪-৬ মিটার দূরে দূরে লাগানো হয়। মে থেকে আগস্ট মাস চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের ১৫-১৫ দিন পূর্বে ৬০ সে. মি. × ৬০ সে. মি. × ৪৫ সে. মি আকারের গর্ত তৈরী করে প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পঁচা গোবর, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করে

ভালোভাবে মিশাতে হবে। গর্তের মাটি ভালোভাবে ওলটপালট করে ঠিক মাঝ বরাবর সোজা করে কলম/চারা রোপণ করে সেটিকে একটি শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

চিত্র ৮. পেয়ারার গর্ত তৈরী, সার প্রয়োগ এবং কলম/চারা রোপণ

পরিচর্যা: পেয়ারা গাছের গোড়া সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে এবং শেষে বাগানে চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা সম্ভব।

সার প্রয়োগ: গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি, মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিন কিস্তিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের গোড়া থেকে ০.৫ মি.-১.০ মি. দূরত্ব থেকে শুরু করে যতদূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সেখানে সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বয়সভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারের নাম	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬ বছর বা তদুর্ধ্ব
গোবর (কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০

সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি (ফল) ধরা অবস্থায় সেচ প্রয়োজন। গাছের গোড়া সবসময় আগাছামুক্ত রাখা ও গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দেয়া প্রয়োজন।

চিত্র ৯. পেয়ারা গাছে সার ও পানি সেচ প্রয়োগ

অঙ্গ ছাঁটাইকরণ: গাছের মরা, রোগাক্রান্ত এবং অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে। কলম/চারার বয়স ২-৩ বছর হলে একে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য মাটি থেকে ৩ -৪ ফুট উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা ৪-৫টি ডাল রেখে বাকী সব ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে। সাধারণত: ফল সংগ্রহের পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা ভালো। অঙ্গ ছাঁটাই এর পরপরই গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল আসে।

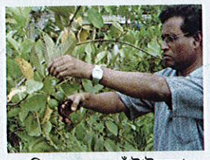
চিত্র ১০. অঙ্গ ছাঁটাইকরণ

ব্যান্ডিং বা শাখা-প্রশাখা বাঁকানো: ব্যান্ডিং বা শাখা-প্রশাখা বাঁকানোর মাধ্যমে পেয়ারায় অসময়ে বা বছরব্যাপী ফুল ও ফল

ধারণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বছরে দু'বার অর্থাৎ এপ্রিল-জুন এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে শাখা-প্রশাখার নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসের মাধ্যমে সারাবছর পেয়ারার ফুল ও ফল ধারণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। গাছের বয়স দেড় থেকে দুই বছর হলেই এ পদ্ধতি শুরু করা যাবে এবং ৫-৬ বছর পর্যন্ত এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো সম্ভব হবে। ডাল বাঁকানোর ১০-১৫ দিন আগে গাছের গোড়ায় সার ও পানি দিতে হবে। ডাল বাঁকানোর সময় প্রতিটি শাখার অগ্রভাগের প্রায় এক থেকে দেড় ফুট অঞ্চলের পাতা ও ফুল-ফল রেখে বাকি অংশ ছেঁটে দিতে হবে। এরপর সুতলি দিয়ে গাছের ডালের মাথায় বেঁধে গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোকে বাঁকিয়ে গাছের কান্ডের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এছাড়া মাটিতে খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথেও বেঁধে দেয়া যেতে পারে। এপ্রিল-জুন সময়ে মাত্র ১০-১২ দিনে এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর সময়ে ২০-২৫ দিন পরে নতুন ডাল গজানো শুরু হয়। নতুন ডাল ১ সে. মি. লম্বা হলে বাঁধন খুলে দেয়া হয়। ডাল বাঁকানোর ৪৫-৬০ দিন পর ফুল ধরা শুরু হয়। এভাবে গজানো প্রায় প্রতি পাতার কক্ষেই ফুল আসে। এপ্রিল-জুন মাসের মধ্যে ডাল বাঁকানো হলে অক্টোবর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। আবার সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে ডাল বাঁকানো হলে ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসে ফল পাকে। এ পদ্ধতিতে সারাবছরই ফলন পাওয়া সম্ভব।

ফল পাতলাকরণ: কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এ অবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ছোট থাকা অবস্থায়ই (মটর দানা অবস্থা) ৫০-৬০% ফল পাতলা করে দেয়া দরকার। কলমের গাছের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ফল নেয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয় বছর অল্প পরিমাণ ফল নেয়া ভালো। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল পাতলা করে প্রায় সারাবছর বারি পেয়ারা-২ জাতের গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফ্রুট ব্যাগিং বা ফল ঢেকে দেয়া: পেয়ারা ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকামাকড়, পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে সহজে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ও আকর্ষণীয় রঙের হয়। ব্যাগিং ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন বা বাদামী কাগজ দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ এবং ০.২ গ্রাম হারে কনফিডর ৭০ ডব্লিউজি বা ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের অন্য কীটনাশক মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

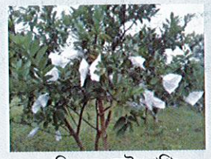
চিত্র ১১. ফ্রুট ব্যাগিং

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

এ্যানথ্রাকনোজ: গাছের পাতা, কান্ড, শাখা এবং ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ রোগ হলে ফলের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ পড়ে। এছাড়া ফল শক্ত, ছোট এবং বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকার সাথে সাথে দাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ফলটি ফেটে বা পঁচে যায়। আক্রান্ত পাতায় মরিচা পড়ার মত দাগ দেখা যায়। কচি ডাল আক্রান্ত হলে তাতে বাদামী দাগ পড়ে ও ডালটি মারা যায়।

চিত্র ১২: এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত ফল